পরমহংস-বিবেকানন্দ সংবাদ : বিহ্বলতার ইতিকথা

বিশ্বজিৎ রায়

রামকৃষ্ণদেবের যাপন-কথা যাঁরা তাঁর জীবৎকালে বা তাঁর প্রয়াণের পরে পরেই নথিভুক্ত করেছিলেন তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে সবাইকে সমান গুরুত্ব দেননি। রামকৃষ্ণদেবের জীবৎকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর যাপন-কথা নানাভাবে আলোচিত। নির্মলকুমার রায় তাঁর 'পুরনো কলকাতার পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ' (উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৯৬) নিবন্ধে সে-সমস্ত সাময়িকীর তালিকা প্রদান করেছিলেন। ঠাকুরকে নানাজন নানাভাবে কলকাতার ভদ্রসমাজের কাছে প্রকাশ করতে চাইছেন। ঠাকুর তো একা নন, তাঁর কাছে নানাজন আসেন—নানা সামাজিক শ্রেণির মানুষ তাঁরা। নিশীথরঞ্জন রায় তাঁর 'রামকৃষ্ণ-সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা' (তদেব) নিবন্ধে লিখেছিলেন, ''রামকৃষ্ণদেবের খ্যাতি যখন তুঙ্গে... সেইসময় কলকাতা থেকে যাঁরা তাঁর কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন তাঁদের পূর্ণ তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়।''[১] তবে তাঁদের যে-'অসম্পূর্ণ' তালিকা নিশীথরঞ্জন দিয়েছিলেন তা খেয়াল করলে দেখা যাবে মূলত 'সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত পরিবারের সন্তান।' পরবর্তী কালে ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার তাঁর নিবন্ধে এই সিদ্ধান্তকেই আর এক ভাবে বিস্তৃত করেছিলেন : ''The cult that developed around Ramakrishna remained an essentially bhadralok affair in Bengal...''[২] এঁদের দুজনের লেখাতেই ঠাকুরের মহিলা ভক্তদের প্রসঙ্গ তেমনভাবে আসেনি। মহিলা ভক্তেরা কিন্তু সকলে মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোক শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না। তাছাড়া ঠাকুরের কাছে কলকাতার ভদ্রলোকদের সমাবেশের আগেই নানা সম্প্রদায়ের সাধক আসতেন, তাঁদেরও ভদ্রলোক শ্রেণিভুক্ত বলা যাবে না। গ্রামসমাজের সঙ্গেও ঠাকুরের যোগ ছিল। তবে একথা ঠিকই যে উনিশ শতকের মুদ্রণ-সংস্কৃতিতে পরমহংসকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর 'ভদ্রলোক' পার্ষদেরা, তাঁদের অনেকেই আবার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

একজন জীবনীকারের কাছে 'ভদ্রলোক'-রামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে যিনি গুরুত্ব পেয়েছেন, অপর জীবনীকারের কাছে তিনি হয়তো গুরুত্ব পাননি। গৃহী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' শ্রীমর 'কথামৃত' ও স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ'-পূর্ববর্তী রচনা।

সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ভক্তদের কথা সামান্যই আছে, বিবেকানন্দের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তবে এই অনুল্লেখ নাকি নরেন্দ্রের ইচ্ছানুসারেই। উদ্বোধন-প্রকাশিত 'জীবনবৃত্তান্ত'-র পাদটীকায় সম্পাদক লিখেছিলেন, ''এই তালিকা হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের (শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের) নাম, শুনা যায়, তাঁহারই ইচ্ছানুসারে বাদ দেওয়া হইয়াছিল।''

শ্রীমর কথামৃতে অবশ্য নরেন্দ্রের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। কথামৃতে রামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ চারবছরের বৃত্তান্ত নথিভুক্ত করেছিলেন তিনি। নরেন্দ্রর সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের প্রথম দেখা ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়াত হন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীম তাঁর কথামৃত যে-কালপর্ব থেকে লিখতে শুরু করেছেন সেই কালপর্বে ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের 'নব-পরিচয়'। নরেন্দ্র তখনও কুড়িতে পড়েননি। ঠাকুর মধ্যচল্লিশ। শ্রীম তাঁর কথামৃতে নিজেকে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কখনও একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, নিজেকে নিজেই 'অপর' হিসেবে তটস্থ-দৃষ্টিতে যেন দূর থেকে দেখছেন। ১৮৮২-র মার্চ। শ্রীম লিখছেন, ''বরাহনগরের নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা-৪টার সময় তিনি [মাস্টার] দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পৌঁছিলেন।... এখনও মাস্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই, তিনি সভামধ্যে একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তসঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। একটি **ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া অনেক কথা বলিতেছেন।**'' (স্থূলাক্ষর সংযোজিত)

শ্রীম এই উনিশ বছরের ছেলেটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। কলেজে পড়েন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। চোখ উজ্জ্বল, কথা ধারালো; দেখলে মনে হয় ভক্তের চেহারা। কথামৃতের বিবরণ ক্রমশ কালের গতিতে যত এগিয়েছে, ঠাকুর-নরেন্দ্র সম্পর্কের নিবিড় চিত্র তত প্রকাশ্য হয়েছে। কথামৃতে নরেন্দ্র যতটা জায়গা পেয়েছিলেন তাঁর গুরুভাইরা ততটা পাননি। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে খানিক অভিমান করেই সেকথা লিখেছেন, ''১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে যে সকল ঘটনা শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত'-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু আমি অল্পবয়স্ক ছিলাম বলিয়া বোধহয় কথামৃতের সকল জায়গায় আমার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, ফলে আমি 'ইত্যাদি'-র মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। এই কথা আমি 'শ্রীম'-র জীবদ্দশায় তাঁহাকে বহুবারই বলিয়াছি, কিন্তু কিজন্য জানি না মাস্টারমহাশয় 'ইত্যাদি'র গণ্ডীতেই আমাকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।''

শ্রীমর বর্ণনায় নরেন্দ্রের গুরুত্বলাভের বড় কারণ নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ। নরেন্দ্র যে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা, রামকৃষ্ণদেব নানা প্রসঙ্গে সেকথা শ্রীম ও অন্যান্যদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং শ্রীম তো এই যুবকটিকে আলাদা করে খেয়াল করবেনই। ঠাকুর কেন নরেন্দ্রকে বেশি ভালবাসেন? তাঁর কথাতেই সে-জবাব মেলে।

ক) ''দেখ, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়—সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচকচ করে কেটে দিতে লাগল।'' (১৮৮২, মার্চ)

খ) ''দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ—গাইতে বাজাতে, বিদ্যায়, আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না—ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন।' (১৮৮২, ২২ অক্টোবর)

গ) ''নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নাই।—যেন কোনও বন্ধন নাই! খুব ভাল আধার। একাধারে অনেক গুণ—গাইতে-বাজাতে, লিখতে-পড়তে! এদিকে জিতেন্দ্রিয়,—বলেছে বিয়ে করবে না। (১৮৮৩, ২০ আগস্ট)

নানা সময়ে নরেন্দ্রের প্রশংসা করে বলা ঠাকুরের কথাগুলি স্নেহভরা। স্নেহভাজন অনুজদের গুণের কথা বড়রা যেভাবে বলেন সেভাবেই ঠাকুর কথা বলছেন। তবে সংসারীরা যে-গুণগুলিকে তত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না সেই গুণগুলির কথা তিনি আলাদা করে বলেছেন। জিতেন্দ্রিয়, বিয়ে করবে না, ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরে মন—একথাগুলি নরেন্দ্র প্রসঙ্গে ঠাকুরের মুখে ফিরে ফিরে আসে।

ঈশ্বর আছেন না নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে কোন ঈশ্বরে কীভাবে বিশ্বাস করা উচিত—এই প্রশ্নগুলি উনিশ শতকের বাঙালি যুবকদের আন্দোলিত করত। উনিশ শতকে যে-ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই সূত্রে এই প্রশ্নগুলি তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ধর্মের সঙ্গে যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধির যোগ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন 'ভদ্রলোক' ব্রাহ্মসমাজীরা। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনকে একদিক থেকে 'বুর্জোয়াদের হিন্দুধর্ম' বলা চলে। ব্রায়ান হ্যাচার 'bourgeois Hinduism' শব্দবন্ধটি ব্রাহ্মসমাজীদের আচরিত ধর্মের সূত্রে সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর অভিমত, ''Tattvabodhini theology of hard work and moral restraint both encoded and legitimated a colonial bourgeois worldview.''[৩] কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, নীতিপরায়ণ, সংযত গৃহস্থ কেবল ধর্মজীবনে নয়, কর্মজীবনেও সাফল্য লাভ করেন। ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে প্রতিনিয়ত সাহেবদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয় যাঁদের সেই ভদ্রলোক-বাঙালিদের কর্মনিষ্ঠ সংযত ধর্মজীবন না থাকলে চলে! 'কুসংস্কার' আর 'লোকাচারগ্রস্ত' হিন্দুদের সঙ্গে বাণিজ্য ও প্রশাসনিকতা চালাতে সাহেবরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। হ্যাচার তাঁর যুক্তিবিন্যাসের সময় ম্যাক্স ওয়েবারের 'প্রোটেস্ট্যান্ট এথিক' (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism) বইয়ের যুক্তিবিন্যাস স্মরণে রেখেছিলেন। ওয়েবার দেখিয়েছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মনীতি পার্থিব উন্নতির অনুকূল ছিল। ধর্মের সঙ্গে সামাজিক উন্নতির যোগসাধন যে সম্ভব সে-বিষয়টি জীবনের শেষপর্বে তাঁর বাংলা রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এ আলোচনা করেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি সেখানে লিখেছিলেন, ''ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।'' এই ধর্মবৃত্তি বিবেকানন্দের মতে দোষের নয়। কারণ তাঁর অভিমত, ''ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর তবে ত্যাগ হবে।'' এ-লেখাতেই সামাজিক হিতাহিতের সূত্রে তিনি বুদ্ধদেব ও যিশুখ্রিস্টের সমালোচনা করেন। ''বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ!!! তারপর ভাগ্যফলে ইওরোপীগুলো প্রোটেস্টান্ট হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।'' বিবেকানন্দ যখন এই নিবন্ধ লিখছিলেন তখন ম্যাক্স ওয়েবারের আলোচনা প্রকাশিত হয়নি। তবে আমেরিকা-ফেরত বিবেকানন্দ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কর্মভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর 'প্রোটেস্ট্যান্ট এথিক' বইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবন-কর্ম-রচনা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর অভিমত—কেবলমাত্র অর্থলোভই ব্যক্তি-মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণ নয়, ফ্র্যাঙ্কলিনের মতো মানুষেরা শ্রমনিষ্ঠতাকে ধর্ম বলেই মনে করতেন। শ্রমনিষ্ঠতা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে আদৃত মূল্যবোধ। বিবেকানন্দও মনে করেন এই উদ্যম ও কর্মময়তা পার্থিব সুখ-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক ধর্ম, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই ধর্ম পালন করা উচিত, তাহলেই জাতি ও দেশের উন্নতি হবে। এই ধর্মকামের ঊর্ধ্বে যাঁরা ওঠেন তাঁরা মোক্ষমার্গী। মোক্ষমার্গের সাধনা কজনই বা করতে পারেন! তাঁর

আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মতে নিঃসন্দেহে মোক্ষমার্গী। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায় বিবেকানন্দ মোক্ষ কী তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। ''মোক্ষ কী?—যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই।... অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না।''

মনে রাখতে হবে এসবই পরিণত বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত। যুবক নরেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি, তবে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন জেগে ওঠে। সেকালে অনেকের মতোই ধর্ম-সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে তিনি আন্দোলিত, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগও ঘটেছিল এসব প্রশ্নের সুবাদেই। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম-বিষয়ক প্রশ্নগুলিকে নীতিবোধ ও শাস্ত্র দিয়ে বিচার করতে চেয়েছিল। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ দুজনেই ধর্মকে বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থের সূত্রে বিচার করতে চাইছিলেন। রামমোহন প্রধান উপনিষদগুলি অনুবাদ করেন, একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্যই তাঁর এই শাস্ত্র-শরণ।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে আঠারো বছর বয়সে দিদিমার প্রয়াণের একদিন আগে তাঁর আশ্চর্য আত্মোপলব্ধির বিবরণ দিয়েছিলেন, ''যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন আঠারো বৎসর।''[৪] আত্মজীবনীর পরবর্তী অংশে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর এই আনন্দ বিষাদ ও উদাসীনতায় রূপান্তরিত হল। ক্রমশই তিনি ধর্মানুসন্ধানী হয়ে উঠলেন ও নিরাময় খুঁজলেন সংস্কৃতভাষাবাহিত শাস্ত্রগ্রন্থে। ''তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল।'' গ্রন্থাভিমুখে যাত্রাই যেন শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালি পুরুষদের অনিবার্য নিয়তি। যুবক নরেন্দ্রের আত্মানুসন্ধানও গ্রন্থকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল, পাশ্চাত্য দর্শন মন দিয়ে পড়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কাছেও গিয়েছিলেন তিনি। তখন অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ আঠারো বছরের যুবক নন—ব্রাহ্মসমাজের ভাল-মন্দের কর্তা। নরেন্দ্রের সব জিজ্ঞাসার সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। তাঁর আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী। সে-অনুবাদের ভূমিকা-রচয়িতা আন্ডারহিল (Evelyn Underhill)। দেবেন্দ্রনাথকে খ্রিষ্টীয় মরমিয়া সাধকদের সমতুল বলে মনে করেছিলেন, তবে ভারতীয় মরমিয়া সাধনার যে-প্রাগাধুনিক ধারাটি ছিল তার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের—কলকাতানিবাসী 'ভদ্রলোক' দেবেন্দ্রনাথের তেমন যোগ ছিল না।

ঠাকুর সে-সময়ের সমাজ-সাপেক্ষে নরেন্দ্রকে বিচার করছেন না, তাঁর মনে হচ্ছে এসবই ব্যক্তিসাপেক্ষ—এসবই নরেন্দ্রের বিশেষ গুণ। ঠাকুর নরেন্দ্রকে খানিক দেশ-কাল-সমাজ বিবিক্ত করেই দেখেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রায় রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রসঙ্গে যে-কথোপকথন তা ক্রমশ বাইরের থেকে ভেতরের দিকে গেছে। 'এহো বাহ্য', 'এহো হয়' এইভাবে এগিয়েছে সাধ্য ও সাধনবস্তুর আলোচনা। এই যে বাইরের লক্ষণ ও ভিতরের লক্ষণকে আলাদা করা, এ মরমিয়া সাধকদের বৈশিষ্ট্য। রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের 'বাহির' ও 'ভিতর' দুই বিচার করছেন। ভিতরের লক্ষণগুলির জন্য নরেন্দ্রকে বিশেষভাবে ভালবাসছেন তিনি। বিবাহ না করা ঠাকুরের মতে নরেন্দ্রের 'জিতেন্দ্রিয়' চরিত্রের লক্ষণ। রামকৃষ্ণদেব যে-সাধনপথের অনুসারী তাতে 'কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ' অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মসমাজীরা এ-বিষয়ে বিশেষ নীতির অনুসারী। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তাঁরা সামাজিক ব্যাধি বলেই মনে করতেন, এগুলিকে অতিক্রম করতে সচেষ্ট হতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পিতার দাপটে প্রথমা স্ত্রী থাকতেই দ্বিতীয়া স্ত্রী পরিগ্রহ করতে বাধ্য হন।

বিষয়টি তাঁকে গভীর নৈতিক সংকটে ফেলে। ব্রাহ্মসমাজে মেয়েদের পড়াশোনার গুরুত্ব স্বীকৃত। এতে নারীস্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এই সামাজিক নীতি ও সংস্কার সূত্রেই ব্রাহ্মসমাজীরা ধর্মজীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নিরাকার ব্রহ্মের ভাবনা। সে-ধর্মজীবন সমাজজীবনেরই অঙ্গ। ধর্মময় সমাজজীবন কীভাবে যাপন করা উচিত সে-বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী পরবর্তী কালে 'গৃহধর্ম'-র মতো নির্দেশিকা-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। নরেন্দ্রের ধর্মজীবন রামকৃষ্ণদেবের কাছে আসার আগে মূলত এই জাতীয় ভাবনাতেই প্রভাবিত। নিজের বাড়িতেও নরেন্দ্র পড়াশোনার পরিবেশ পেয়েছিলেন—পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছেলের পড়াশোনার বিষয়ে সচেতন, বাড়িতে পাঠশালা বসিয়েছিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী সুশিক্ষিতা—নরেন্দ্রের ইংরেজি-শিক্ষার হাতেখড়ি তাঁর কাছেই। বাড়িতে গানের কদর ছিল। নরেন্দ্রের যে-গুণগুলির কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন তা বাড়ির পরিবেশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া। নরেন্দ্রের পরিবারে অবশ্য সন্ন্যাসের ঐতিহ্যও ছিল। তাঁর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। পরিজনেরা অনেকে মনে করতেন দুর্গাপ্রসাদই নরেন্দ্র হয়ে ফিরে এসেছেন। এ-জাতীয় চিন্তা ও তুলনা বঙ্গদেশের কৌমসমাজে সুপ্রচলিত ছিল। ঠাকুর 'জিতেন্দ্রিয়' বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ব্রাহ্মসমাজীদের ধর্মজীবন-যাপনের রীতি থেকে যেন সচেতনভাবেই নরেন্দ্রকে আলাদা করে দিতে চান। এমনিতে গৃহী ভক্তদের সম্পর্কে ঠাকুরের আপত্তি কিছু নেই। একটা পর্বের পর গৃহজীবনে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করতে বলেন তিনি। তবে তিনি ভক্তদের মধ্যে দুটি থাক নির্দেশ করেন—গৃহী ও সন্ন্যাসী। যে-দল সন্ন্যাস নেবে, সংসার করবে না, নরেন্দ্রকে সেই দলের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চান তিনি। ভাবেন ও বলেন, এ নরেন্দ্রের জন্মগত প্রবণতা। ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরে মন—একথার মধ্যে সেই ইঙ্গিত রয়েছে।

কথামৃতের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় উনিশ বছরের নরেন্দ্রের গৃহ, সংসারধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট বিরক্তি রয়েছে। সংসারীদের সম্বন্ধে তিনি 'কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে' এই উপমা প্রয়োগ করেছিলেন (১৮৮২, মার্চ)। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, ''না রে, অত দূর নয়। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন।'' পরবর্তী কালে সংসার ও গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের এই বিরক্তি ছিল না। থাকলে ইংরেজিতে 'কর্মযোগ'-এর মতো বই লিখতেন না। সে-বই একদিক থেকে ভাল-গৃহস্থ হওয়ার উপায় বর্ণনা। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'গৃহধর্ম' বইয়ের সঙ্গে বিবেকানন্দের ইংরেজি 'কর্মযোগ' এক অর্থে তুলনীয়, আবার আর এক অর্থে তুলনীয় নয়। বিবেকানন্দ গৃহীর আদর্শ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপাস্য নন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে শুধু তাঁর গুণের জন্য ভালই বাসছেন না, নরেন্দ্রের প্রতি তাঁর মনোভাবও অকপটে জানাচ্ছেন। নরেন্দ্র আর ঠাকুরের নৈকট্যের সেই অকপট চিত্র শ্রীম লিখে রাখছেন। সেই নৈকট্যের আবেগ ও আকুতি কলকাতার 'ভদ্রলোক' সমাজের যুক্তিতর্ক মেনে চলেনি। ঠাকুরের কথায় নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উপমায় মাঝেমাঝেই পতি-পত্নীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতা ফিরে যাবেন। ঠাকুর বলছেন, ''দেখ, আর একটু বেশি বেশি আসবি। সবে নূতন আসছিস কিনা ! প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন পতি (নরেন্দ্র ও মাস্টারের হাস্য)। কেমন আসবি তো?'' (১৮৮২, মার্চ) ১৮৮২-র অক্টোবর মাস, পুজো আসি-আসি। নরেন্দ্র

দক্ষিণেশ্বরে এসে আহার করলেন। খাওয়ার পর ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতা হল। ''ঠাকুরও বালকের ন্যায় নরেন্দ্রের কাছে বিছানায় বসিলেন। ভক্তদের সহিত বিশেষত নরেন্দ্রের সহিত, নরেন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে মহা আনন্দে কথা কহিতেছেন।'' কখনও কখনও কীর্তনের আয়োজন হত। সংগীত নরেন্দ্র ও ঠাকুরের সংযোগের অন্যতম মাধ্যম। শ্রীম জানাচ্ছেন, ''খোল করতাল লইয়া কীর্তন হইতেছে।... অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে গাহিতেছেন... কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বারবার আলিঙ্গন করিলেন! বলিতেছেন, 'তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে!!!' '' (১৮৮২, ১৬ অক্টোবর)

এসবই ১৮৮১-৮২ সালের ঘটনা। ব্রাহ্মসমাজের যে-যুক্তিনিষ্ঠ শীলিত উপাসনা পদ্ধতি তার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যের তুলনা চলে না। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে আচার্য বেদির উপরে অবস্থান করেন। ঠাকুর তাঁর খাটটি থেকে নেমে এসে নরেন্দ্রের বিছানায় বসে হাসিমুখে কথা বলছেন, দুজনে কীর্তনসঙ্গ উপভোগ করছেন। নরেন্দ্রকে পতি ও নিজেকে পত্নী বলে রসিকতা করছেন। সে-রসিকতার মর্ম বুঝে মাস্টার আর নরেন্দ্র হাসছেন। এই উপমা ও কীর্তনপরবর্তী আলিঙ্গন অনিবার্যভাবে প্রাগাধুনিক পর্বের চৈতন্যবলয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। নরেন্দ্র কলেজে পাশ্চাত্য-দর্শন পড়েছেন, শহর কলকাতায় বড় হয়ে উঠেছেন। কলকাতার কবিগান-যাত্রা—যা তখনকার জনসংস্কৃতির অঙ্গ—তার সঙ্গে নরেন্দ্রের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু পরমহংস তাঁর গ্রামজীবনের সূত্রে ও পরবর্তী সাধুসঙ্গের সুবাদে প্রাগাধুনিক মরমিয়া জীবনধারার সঙ্গে যেভাবে পরিচিত সে-পরিচিতি কিন্তু নরেন্দ্রের নেই। মনে রাখতে হবে 'ভাবাবেগ' মাত্রই সমাদরযোগ্য নয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে—নরেন্দ্রের সঙ্গে তখনও ঠাকুরের দেখা হয়নি—শেষবারের মতো রামকৃষ্ণদেব কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। ভাল কীর্তন শোনাবার জন্য তিনি কীর্তনিয়া ধনঞ্জয় দে এবং খোলবাদক রাইচরণ দাসকে ডেকে আনিয়েছিলেন।[৫] কীর্তনিয়াদের মধ্যে সবাই যোগ্য আধার নন, আবেগের তারল্য কখনও কখনও বিপন্নতাও সৃষ্টি করত। প্রেমী কীর্তনিয়া আর তাঁর কন্যা বাসনাবালা ঠাকুরের আনুকূল্য পাননি। অধ্যাত্ম আবেগের অছিলায় শরীর-সম্বন্ধীয় অজাচারের প্রকাশ বিষয়ে ঠাকুর নানাভাবে ভক্তদের সাবধান করে দিতেন।

ঠাকুরের আবেগের তীব্রতায় নরেন্দ্র অনেক সময় বিব্রত হন। কলকাতার ভদ্রসমাজের অন্তর্ভুক্ত যুবকটির কাছে আবেগের এই তীব্রতা ও প্রকাশভঙ্গি নতুন, অপরিচিত। প্রাগাধুনিক মরমিয়া সাধকদের জীবনধারার দিকে তাকালে অবশ্য এই তীব্র আবেগ অচেনা লাগে না। যুবক নরেন্দ্র চৈতন্যজীবনীকাব্য হয়তো তেমন করে পড়েননি। পড়লে ঠাকুরের এই আবেগের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারতেন। ক্রমে নরেন্দ্র ঠাকুরের এই ভালবাসার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে না এলে ঠাকুর অস্থির হতেন। কয়েকদিন আসেননি বলে নরেনের সন্ধানে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যেতে দ্বিধা করেননি। ব্রাহ্মসমাজীদের মধ্যে অনেকেই ঠাকুরকে পছন্দ করতেন না—তাঁর প্রভাব কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণের উপরে পড়েছে বলে ব্রাহ্মরা বিচলিত। ভাবোন্মাদ অবস্থায় ঠাকুর উপাসনাগৃহের বেদির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে কয়েকজন ব্রাহ্ম ভাবলেন তিনি বেদি দখল করতে চাইছেন। উপাসনাগৃহের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। সেখানে গানের দলে নরেন্দ্র ছিলেন। তিনি ঠাকুরের আসার কারণ বুঝতে পেরে পেছনের দরজা দিয়ে তাঁকে উপাসনাগৃহ থেকে বের করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলেন।

চৈতন্যজীবনীকাব্যে নানা স্থানে চৈতন্যদেবের

ভাবতন্ময় দশা বিবৃত হয়েছে। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, ''বাহ্য হইলে ঠাকুর সভার গলা ধরি।/ যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥/ কোথা গেলে পাইব সে মুরলীবদন।/ বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন॥''[৬] কেবল যে কৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্য এমন আকুল হতেন তা নয়, তাঁর এই আকুলতা সহচরদের কেন্দ্র করেও পরিব্যাপ্ত হত। চৈতন্য-ভাগবতের অষ্টাদশ অধ্যায়ে চৈতন্যদেব ও তাঁর সহচরদের নাট্য-নৃত্যের প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখানে রয়েছে গদাধরের কথা। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, ''গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্তিমতী/ সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥/ আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারবার।/ গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥''[৭] ঠাকুর নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উপমা দিতে গিয়ে যেমন পতি-পত্নী প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, এখানেও চৈতন্য-গদাধর সম্পর্কের সূত্রে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপিত। এই অধ্যায়টি লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে চরিত্রগুলির উপর লিঙ্গপরিচয় নানাভাবে আরোপিত। চৈতন্যদেব যখন বলেন ''গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার'' তখন তাঁর উপর কৃষ্ণস্বরূপ আরোপিত। আবার কখনও চৈতন্যদেবের জননী-আবেশ হয়। তখন, ''মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।/ স্তনপান করায়ে পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥''[৮] এই যে চৈতন্যদেব কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি—এই বিরোধের সমাধান করার জন্যই 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তাঁকে 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতকৃষ্ণ' হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছিল—একই অঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণ।

ভক্তদের এই ভাবনা ও সাধকদের এই আধ্যাত্মিক অনুশীলন অনেকসময় ইতিহাসবিদদের কৌতুকের কারণ। চৈতন্যদেবকে 'transcendental hermaphrodite' বলে মন্তব্য করেছিলেন ননীলাল সেন। আবার প্রতিমুহূর্তে 'প্রাকৃতিক' ও 'সামাজিক' লিঙ্গপরিচয় অতিক্রমের চেষ্টাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁদের দেহমনের প্রবণতার স্বরূপ বিচার করতে চেয়েছেন কেউ কেউ। চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব দুজনকে ঘিরেই এ-জাতীয় 'আধুনিক' আলোচনা চোখে পড়ে। অমূল্যচন্দ্র সেন তাঁর 'ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য' বইটিতে বেশ কিছু বিরুদ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, বইটি একসময় সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। বই বাজেয়াপ্ত করা সমর্থনযোগ্য নয়।[৯] তবে অমূল্যচন্দ্র সেন চৈতন্যদেবের 'আধ্যাত্মিক সাধনা'কে যেভাবে গুরুত্বহীন করে দিয়েছিলেন সেই 'বস্তুবাদী' দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা এখন অনেক গবেষকেরই আলোচনার বিষয়। আশিস নন্দীর সঙ্গে জয়ন্তী বসুর কথোপকথনে বিষয়টি উত্থাপিত।[১০] আশিস নন্দী গণনাথ ওবেসেকেরের 'The Awakened Ones/ Phenomenology of Visionary Experience' বইটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ওবেসেকেরের বইতে শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ নেই, তবে সাধকদের নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার মুহূর্তটি সেখানে নানাভাবে আলোচিত। জয়ন্তী বসু প্রশ্ন করেছিলেন 'স্পিরিচুয়ালিটি কী?' আশিস নন্দীর উত্তর : ''এক ধরনের self-transcendence।''[১১] এই নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার সাধনাই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা। নিজেদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক লিঙ্গের কাঠামোটি তাঁরা অতিক্রম করতে তৎপর। সেই কাঠামোটি অতিক্রমের অবলম্বন চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রে মা কালী। রামকৃষ্ণদেব কালী ছাড়া অপরাপর মূর্তি ও ভাবের প্রতিও অভিনিবিষ্ট—মত ও পথের নানাত্বে বিশ্বাসী। এই 'ছাপিয়ে যাওয়া' প্রসঙ্গটি অমূল্যচন্দ্রের বিশ্লেষণে গুরুত্ব পায় না বলেই 'চৈতন্য-গদাধর' সম্পর্ককে তিনি দুই অবয়বের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে আটকে রাখেন।

রামকৃষ্ণদেব কলকাতার কাছেই দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন। অজাচার নিয়ে নানা কেচ্ছা উনিশ

শতকের কলকাতার বাতাসে পাক খেত। একদিকে 'সম্বাদ রসরাজ' সাময়িকপত্র বিভিন্ন ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করছে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বটতলার অশ্লীল বই প্রচুর সংখ্যায় বিক্রি হচ্ছে, অন্যদিকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি অশ্লীলতা নিবারণ আইন জারি হল। ভিক্টোরীয় শুচিতার ধারা কলকাতার ভদ্রসমাজে প্রবল হয়ে উঠছে। ধর্মের আবরণে ব্যভিচার সম্বন্ধেও কলকাতা-সমাজ তখন সচেতন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরের শতকে 'নারায়ণ' পত্রিকায় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক ক্রমে যে-রচনাটি প্রকাশ করেন সেটির একটি কিস্তি 'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত'। তাঁর অভিমত, ''বৌদ্ধধর্মের মধ্যে গুহ্যপূজা আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কী? অর্থ এই যে, সে-সকল দেবমূর্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ওইসকল মূর্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর।... সেই সকল মূর্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল তখন আর অধঃপাতের বাকি রইল কী? সে সকল উপাসনার প্রকার আরও অশ্লীল—সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না। এজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এইসকল পুঁথি ঘোমটা দেওয়া কাম-শাস্ত্র। আমি বলি, তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ।''[১২]

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে-কথাগুলি হরপ্রসাদ লিখেছিলেন সেই কথাগুলি উনিশ শতকে তন্ত্রাশ্রিত নানা ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে সত্য। সহজিয়া বৌদ্ধদের মতো সহজিয়া বৈষ্ণবদের নানা সম্প্রদায় সম্বন্ধে তখনকার কলকাতা সমাজ সন্দিহান। সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইসব ধারার পিচ্ছিল অজাচার সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রিয়াশীল। রামকৃষ্ণদেবের পায়ে এসে পড়েছিলেন প্রেমী কীর্তনীয়া, মাঝারি বয়সের একটি মেয়ে। ''আমার এ প্রেম রাখব কোথা!'' এই তখন তাঁর কীর্তনের পদ। ঠাকুর তাড়াতাড়ি একটি ভাঙা ধুনুচি নিয়ে এলেন। ধুনুচিটি কাছের খাঁ-পুকুরের ধারে গুলঞ্চগাছের তলায় ছাইগাদার পাশে পড়েছিল। ঠাকুর নাকি বলেছিলেন, ''এই ভাঙা ধুনুচিতে রাখ; তোমার যেমন প্রেম, এ পাত্রটি তার উপযুক্ত।''[১৩] ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের তন্ত্র ও অন্যান্য গুহ্য-সাধনা করতে বারবার নিষেধ করতেন। গুহ্য-সাধনার বিপদ সম্বন্ধে তিনি যেমন সচেতন, তেমনই ভিক্টোরীয় শুচিবায়ুগ্রস্ততাও কিন্তু তাঁর ছিল না। স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নথি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''কি জানিস—(তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধানখেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়!... আর মনে একবার-আধবার কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখনও কখনও শরীরের ধর্মে আসে যায়...।''

খ্রিস্টধর্মে ও ব্রাহ্মসমাজে যে-পাপবোধ ক্রিয়াশীল সেই পাপবোধের বালাই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মে নেই। জিতেন্দ্রিয় হওয়া, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করা তাঁর সাধনের আদর্শ। তবে একথাও তিনি স্বীকার করেন সবাই সে-আদর্শে উপনীত হতে পারবেন না। যাঁরা পারলেন না তাঁদের 'পাপী' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ নারাজ। নিজের সম্বন্ধেই তিনি বলেন, ''এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি আর এমনই কামের তোড় এল যে আর সামলাতে পারিনি!'' এই অকপটতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ অকপটে তাঁর এই সাধনজীবন প্রকাশ করেছে, সহজিয়াদের মতো কোনও গুহ্যতা সেখানে নেই। লীলাপ্রসঙ্গে তাঁর

স্ত্রীভক্তদের জবানবন্দি রয়েছে। ''ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না। মনে হইত আমাদেরই একজন।'' ঠাকুরের সামনে স্ত্রীভক্তরা অসংকোচ, অকপট। অন্য পুরুষেরা এলে তাঁরা সেকালের দেশাচার অনুসারে সলজ্জ-সশঙ্ক হয়ে উঠতেন। লীলাপ্রসঙ্গ থেকে জানা যাচ্ছে কম্বুলিটোলায় ঠাকুর মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীমর বাড়িতে গেছেন। সেখানে স্ত্রীভক্তরা হাজির, ঠাকুরকে সর খাওয়াবেন। ঠাকুর খুশি, সহজ কথাবার্তা হচ্ছে। এমন সময় 'মোটা বামুন' প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঢুকেছেন। তাঁকে দেখে লজ্জায় পাঁচজনা স্ত্রীভক্ত কী করেন? বয়স্কারা জানলায় বসে রইলেন। আর ''আমরা তিনটেয় ঠাকুর যে তক্তপোষে বসেছিলেন তার নিচে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইলুম। মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠল।...'' এঁরাই জানিয়েছেন, ''এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না! কাছে যেতে দিতেন না। আমরা শুনে হাসি ও মনে করি—তবু আমরা এখনও মরিনি!''[১৪] এই প্রেক্ষাপট ও সাক্ষ্য খেয়াল করলে বোঝা যায় 'পাপবোধ' ও 'অবদমন' এই দুই ভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিচলিত নন, তার সঙ্গে রয়েছে তাঁর নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। যখন স্ত্রীভাবে সাধনা করতেন তিনি, তখন মথুরবাবুর অন্তঃপুরে থাকতেন। এ-সমস্তই কলকাতা সমাজের কাছে প্রকাশ্য। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, ঠাকুর নিজেও অকপটে জানিয়েছেন। যদি শরীর-সম্বন্ধী কোনও অজাচার তাঁর সাধনায় প্রকাশ পেত তাহলে কলকাতার ভদ্রলোকেরা তাঁকে ছেড়ে কথা কইত না। আর ভদ্রলোক ছাড়াও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষজন যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন ও আশ্রয় পেতেন তাঁরাও এভাবে ঠাকুরের ভাবে 'মুগ্ধ' হতেন না। অবশ্য ঠাকুরকে নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। তাঁর প্রয়াণের পর তিনি পরমহংস উপাধির যোগ্য কি না এসব নিয়ে কথা উঠেছে, শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁকে পরমহংস বলতে নারাজ, 'রামকৃষ্ণ অবধূত' বলা যেতে পারে। তর্কচূড়ামণি লিখেছিলেন, ''যিনি নির্ব্বিকল্প-সমাধিভূমিতে আরোহণ করিতে সমর্থ, তিনি ব্যুত্থানের অবস্থায়ও শারীরিক ও মানসিক পীড়ার দ্বারা পরিবাধিত হন না এবং বাধা-বোধ হইলেও তৎক্ষণাৎ সমাধির আশ্রয়ে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। রামকৃষ্ণ কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। অতএব তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত, ইহা আমি বলিতে পারি না।''[১৫]

অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ গলরোগের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন ও আর্তনাদ করছেন বলে তিনি সমাধির নির্বিকল্প স্তরে উপনীত হতে পারেননি বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে-বঙ্গজরা, তাঁরা তাঁর চরিত্রের আর কিছু 'গুহ্য' ত্রুটি দেখলে সহজে ছেড়ে দিতেন না। কাজেই তিনি 'গুহ্য-যোগাচারী' হলে সেকথা প্রকাশ্যে আসতই। তাঁর সাধনার প্রধান লক্ষ্য, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে, ''তিনি সত্য মননে সমস্ত শর্ত এবং রীতিপদ্ধতিকে (উপাধি) অস্বীকার করেন।''[১৬] প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক লিঙ্গের কাঠামোকে অস্বীকার করাও 'উপাধি' অস্বীকার করা। এই 'উপাধি' অস্বীকারের সাধনাই প্রাগাধুনিক ভক্তি আন্দোলনের মুখ্য হয়ে উঠেছিল, রামকৃষ্ণদেব সেই ধারারই অন্তর্গত তবে প্রাগাধুনিক ভক্ত-সাধকদের যা করতে হয়নি তাঁকে তা করতে হয়েছিল। 'আধুনিক' কলকাতা শহরের সঙ্গে অবিরত কথোপকথন চালাতেন তিনি—নরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমনই কথোপকথন। নরেন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসাও উপাধি অস্বীকারের চিহ্নই বহন করছে।

ঠাকুর নরেন্দ্রের প্রতি যেভাবে আবেগ-তাড়িত হন সেই আবেগের গাঢ়ত্ব অপরিসীম, ঠাকুর সেই আবেগের চরিত্র অনুধাবনে সচেষ্ট। ১৮৮৩ সালের ২০ আগস্ট শ্রীম তাঁর 'কথামৃত'-এ লিখেছেন,

ঠাকুর বলছেন, ''নরেন্দ্র বেশি আসে না। সে ভাল। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'' ১৮৮৩, ২৮ নভেম্বর ঠাকুর মন্তব্য করলেন, ''নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই, তোর বাপের নাম কী? তোর বাপের কখানা বাড়ি?'' ১৮৮৩, ২৪ ডিসেম্বর ঠাকুর মণিকে বললেন, ''আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব। মা-কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বলত; আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, 'শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস না।' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না।''

নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুরের এই 'বিহ্বলতা' চৈতন্যভাগবতের পঙ্‌ক্তি মনে করিয়ে দেয় : 'সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরমবিহ্বল'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ বিহ্বল বলতে প্রেমপরবশ, প্রেমে আত্মহারা হওয়াকে বুঝিয়েছেন। সেই প্রেম কোনও উপাধি বা শর্তনির্ভর নয়। ঠাকুর তাই বলেন, নরেন্দ্রের বাপ বা বাড়ির কথা তাঁর কাছে একেবারেই গুরুত্বহীন। এই প্রেমপরবশ হয়ে কি ঠাকুর নরেন্দ্রকে অধিকার করতে চান? না, নরেন্দ্র তাঁর লক্ষ্য নন, নরেন্দ্রের মধ্যে নিরুপাধিক প্রেমের আবেগ সঞ্চার করাই তাঁর লক্ষ্য। সেই নিরুপাধিক আমি-হারা দশায় উপনীত হওয়ায় জন্য ঠাকুরের অন্যতম অবলম্বন কালী। সেই কালীকে অবজ্ঞা করলে ঠাকুর তাই রেগে যান। নরেনকে বলেন, ''শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস না।'' নরেন্দ্র ক্রমশ আর কিছু বলেন না, তাঁর যুক্তির ধারা যেন মরমিয়া সাধকের অভিজ্ঞতার ধারে আর ভালবাসার টানে ভিন্নপথগামী।

নরেন্দ্র এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছেন। ১৮৮৫, ২৪ অক্টোবর শ্রীমর কথামৃতে ঠাকুর জানালেন, ''ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আসবে—যিনি এর ভিতর আছেন, তাঁতে! নরেন্দ্রকে দেখছো না?—সব মনটা ওর আমারই উপর আসছে!'' অর্থাৎ ঠাকুরের লক্ষ্য যেমন নরেন্দ্র নন তেমনই ঠাকুর চান নরেন্দ্রের লক্ষ্যও যেন তিনি না হন। 'যিনি এর ভিতর আছেন', তিনি নরেন্দ্রর লক্ষ্য হোন। ১৮৮৫, ২৫ অক্টোবর। ঠাকুরের কথায় নরেন্দ্র গান গাইছেন, ''আমায় দে মা পাগল করে।/আর কাজ নেই মা জ্ঞান বিচারে॥'' এর কিছুদিন পর নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হল, অর্থসংকট প্রবল। ১৮৮৬, ৪ জানুয়ারি। নরেন্দ্র মণিকে বলছেন, ''আজ সকালে বাড়ি গেলাম। সকলে বকতে লাগল,—আর বললে, কি হো-হো করে বেড়াচ্ছিস? আইন একজামিন (বি. এল) এত নিকটে, হো-হো করে বেড়াচ্ছ... দিদিমার বাড়িতে, সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এল,—পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস! বুক আটুপাটু করতে লাগল!—অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই। তারপর বইটই ফেলে দৌড় !—রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতো-টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইল! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম।... গায়েময়ে খড়, আমি দৌড়ুচ্চি, ... কাশীপুরের রাস্তায়।''

এর কিছুদিন পরে ঠাকুরের প্রয়াণ হবে। কথামৃতের শেষের দিকে নরেন্দ্রের এই কান্না, গায়েময়ে খড় মেখে ছুট বুঝিয়ে দেয় ভদ্র সংস্কৃতিতে নরেন্দ্র ঔপনিবেশিক আধুনিকতার হাতফেরতা যা কিছু শিখেছিলেন সেই শেখাটিকেই প্রশ্নের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছেন ঠাকুর। সেই শেখার শর্ত বা উপাধি যখন প্রশ্নের মুখে পড়ল তখন নরেন্দ্র সত্য-সত্যই বাক্যিহারা। পিতার প্রয়াণ ও কিছুদিন পরেই তাঁর আচার্যের প্রয়াণ নরেন্দ্রকে গভীর সংকটে ফেলবে। সেই সংকট অতিক্রম করে নরেন্দ্র ক্রমে বিবেকানন্দ হয়ে উঠবেন।

এই বিবেকানন্দ ঠাকুরের মতো কলকাতার প্রান্তে মরমিয়া সাধনধারায় জীবন অতিবাহিত করেননি। আচার্যদেব তাঁকে যে-আশ্চর্য মরমিয়া অভিজ্ঞতা ও

অনুভূতির মুখোমুখি করেছিলেন, তার স্বাদ-স্মৃতি সজীব ছিল বটে কিন্তু পরাধীন দেশের ও বিশ্বের দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে তিনি মাথা ঘামিয়েছেন। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর গুরুভাইদের দেশ ও সমাজের কাজে নিযুক্ত করেছেন। সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনের ঝরাপাতা'য় লিখেছিলেন, ''তাঁর শিষ্যেরাই কেউ কেউ বলতেন—'পরমহংসদেবের আমলে বেশ ছিলুম। ভগবানের ধ্যানে ভোঁ হয়ে থাকতুম, কোনও বালাই ছিল না। স্বামীজীর কি হল—আমেরিকা থেকে ফিরে এসে খালি বলেন—কাজ, কাজ, কাজ—সেবা, সেবা, সেবা। একদণ্ড স্থির হয়ে বসার যো নেই, মহাবিপদেই পড়া গেছে।' ''[১৭]

রামকৃষ্ণদেবের প্রয়াণের পর দেশ ও সমাজের কাজে বিবেকানন্দ কতটা গুরুত্ব দিতেন তা তাঁর চিঠিপত্র পড়লেই টের পাওয়া যায়। তিনি এভাবে কর্মময় হয়ে উঠুন, এ নাকি ঠাকুরের অভিপ্রেত একথা সুপ্রচলিত। নানা দেশ ঘুরে দেখছেন বিবেকানন্দ, সেই দেশ দেখার অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে। শ্রীমকে বলেছিলেন নরেন্দ্র, ''তিনি ভালোবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন।'' (১৮৮৭, ২৫ মার্চ) তখন ঠাকুর দেহে নেই। সেই ভালবাসা হেতু ও উপাধিকে অস্বীকার করে। তবে নরেন্দ্র জানেন এই উপাধিহীন হেতুহীন ভালবাসার জগৎ 'আধুনিক' রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে রক্ষা করা কঠিন। সন্ন্যাসকে কেবল উপাধিহীন ভালবাসার সাধনসীমায় ধরে রাখলে অনধিকারীদের দৌরাত্ম্যে ভালবাসার কুসুমে কীটও প্রবেশ করতে পারে, তাই নিষ্কাম কর্মের হিতব্রতে সন্ন্যাসকে পরাধীন ভারতবর্ষে দেশ-কালের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। ✠

তথ্যসূত্র

১। সংকলন : অর্ণব নাগ, *শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা* (সূত্রধর : কলকাতা, ২০১৫), পৃঃ ৯০ [এরপর, *শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা*]

২। *Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times*, *Writing Social History* (OUP: New Delhi, 1997), পৃঃ ২৮৩

৩। Brian A. Hatcher, *Bourgeois Hinduism, or the Faith of the Modern Vedantists* (OUP, 2008), পৃঃ ১০

৪। সম্পাদক : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, *শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*, (বিশ্বভারতী : কলকাতা, ১৯২৭), পৃঃ ৪০

৫। দ্রঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমকালের কামারপুকুর* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার : কলকাতা, ২০২০), পৃঃ ১১০

৬। বৃন্দাবন দাস, *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, সম্পাদক : সুকুমার সেন, (সাহিত্য আকাদেমি : দিল্লি, ১৯৯১), পৃঃ ১০৪

৭। তদেব, পৃঃ ১৮৬

৮। তদেব, পৃঃ ১৮৮

৯। দ্রঃ সুচিত্রা ঘোষ, *একটি পুস্তকের অপমৃত্যু* (গ্রন্থাগার, ১৩৭৩), পৃঃ ৩৯৫-৩৯৭

১০। দ্রঃ *ফুটপাথ পেরোলেই সমুদ্র : আশিসবাবু আপনি কি আত্মগত?* (তালপাতা : কলকাতা, ২০১৬), পৃঃ ১৭৫-৭৭

১১। তদেব, পৃঃ ১৭৫

১২। সম্পাদক : সত্যজিৎ চৌধুরী, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ : কলকাতা, ১৯৮৪), ৩, পৃঃ ৩৭৬

১৩। দ্র. ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ*, (ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৮১), পৃঃ ২৩৮-৩৯

১৪। দ্রঃ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন, ২০১৪), ভাগ ১, গুরুভাব— পূর্বার্ধ, পৃঃ ১৬-১৯

১৫। *শ্রীরামকৃষ্ণচর্চা*, পৃঃ ২১৪

১৬। তদেব, পৃ. ১৬৭

১৭। সরলাদেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝরাপাতা*, (দেজ : কলকাতা, ২০১২), পৃঃ ১৫১